আল বালাদ

৯০

নামকরণ

প্রথম আয়াত لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভংগী মক্কা মু'আয্‌যমার প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল যখন মক্কার কাফেররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট্ট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণতার প্রমান। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিণতি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোমুখি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মক্কা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়েশের জায়গা নয়। এখানে ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে আনন্দ উল্লাস করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়নি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আন নাজ্‌মের لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকুর ফলেরই সে অধিকারী হবে) আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে

সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঞ্চল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন–সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় বহরের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অথচ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন–সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন্ মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলব্ধির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে ভালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্গম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে ঃ গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিত্যাগ করে নিজের ধন–সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান আনতে হবে আর ঈমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্যপ্রীতির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করুণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই থাকবে বন্ধ।

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ① وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ② وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ③ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ④ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ⑤

না,[১] আমি কসম খাচ্ছি এই নগরের।[২] আর অবস্থা হচ্ছে এই যে (হে নবী!) তোমাকে এই নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।[৩] কসম খাচ্ছি বাপের এবং তার ঔরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।[৪] আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।[৫] সে কি মনে করে রেখেছে, তার ওপর কেউ জোর খাটাতে পারবে না?[৬]

১. ইতিপূর্বে সূরা কিয়ামাহর ১ টীকায় "না" বলে বক্তব্য শুরু করে তারপর কসম খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। সেখানে আমি বলেছি, এভাবে বক্তব্য শুরু করার মানে হয়, লোকেরা কোন ভুল কথা বলছিল, তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, আসল কথা তা নয় যা তোমরা মনে করছো বরং আমি অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, যে কথার প্রতিবাদে এই ভাষণটি নাযিল হয়েছে সেটি কি ছিল? এর জবাবে বলা যায়, পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি একথা প্রকাশ করছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, আমরা যে ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করেছি তাতে কোন দোষ নেই, কোন গলদ নেই। খাও-দাও ফূর্তি করো, তারপর একদিন সময় এলে টুপ করে মরে যাও, ব্যাস্, এই তো দুনিয়ার জীবন! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামখা আমাদের এই জীবনধারাকে ত্রুটিপূর্ণ গণ্য করছেন এবং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ব্যাপারে আবার নাকি আমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের কাজের জন্য আমাদের শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করতে হবে।

২. অর্থাৎ মক্কা নগরের। এখানে এই নগরের কসম কেন খাওয়া হচ্ছে সে কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা জানতো, কিভাবে পানি ও বৃক্ষলতাহীন একটি ধূসর উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের

মাঝখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্ত্রী ও একটি দুধের বাচ্চাকে এখানে এনে নিঃসংগভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর–দূরান্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম'–সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজমিনে, যেখানে আইন শৃংখলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

৩. মূলে বলা হয়েছে اَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ । মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, তুমি এই শহরে 'মুকীম' অর্থাৎ মুসাফির নও। তোমার 'মুকীম' হবার কারণে এই শহরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে গেছে। দুই, যদিও এই শহরটি 'হারম' তবুও এমন এক সময় আসবে যখন কিছুক্ষণের জন্য এখানে যুদ্ধ করা তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তিন, এই শহরের বনের পশুদের পর্যন্ত মেরে ফেলা এবং গাছপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা আরববাসীদের নিকট হারাম এবং সবাই এখানে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে হে নবী, তোমার জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। তোমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া এবং তোমাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা হালাল করে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তিনটি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে তবুও পরবর্তী বিষয়বস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রথম অর্থ দু'টি এর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তৃতীয় অর্থটির সাথে এর মিল দেখা যায়।

৪. যেহেতু বাপ ও তার ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তাঁর ঔরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ওপরে যে কথাটির জন্য কসম খাওয়া হয়েছে এটিই সেই কথা। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামে শুয়ে শুয়ে সুখের বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। এই মক্কা শহর সাক্ষী, আল্লাহর কোন এক বান্দা এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সাক্ষ দিচ্ছে, একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর মায়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র হিসেবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত, বিপদ ও কঠিন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো সেও যখন

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۞ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۞ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞

সে বলে, আমি প্রচুর ধন–সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।[৭] সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?[৮] আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোঁট দেইনি?[৯] আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?[১০] কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।[১১] তুমি কী জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বমুক্ত করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো।[১২]

মায়ের পেটে অবস্থান করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার ভয় ছিল। সে মায়ের পেটেই মরে যেতে পারতো। অথবা গর্ভপাত হয়ে তার দফারফা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে মাত্র এক চুলের বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মলাভ করার পর সে এত বেশী অসহায় ছিল যে, দেখাশুনা করার কেউ না থাকলে সে একাকী পড়ে মরে যেতো। একটু হাঁটা চলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রতি পদে পদে আছাড় খেয়ে পড়তো। শৈশব থেকে যৌবন এবং তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে যে, এর মধ্য থেকে কোন একটি পরিবর্তনও যদি ভুল পথে হতো তাহলে তার জীবন বিপন্ন হতো। সে যদি বাদশাহ বা একনায়ক হয় তাহলে কোন্ সময় কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র না হয় এই ভয়ে সে এক মুহূর্ত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে না। সে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে। সে নিজের যুগে কারুনের মতো ধনী হলেও কিভাবে নিজের ধন–সম্পদ আরো বাড়াবে এবং কিভাবে তা রক্ষা করবে, এই চিন্তায় সবসময় পেরেশান থাকে। মোটকথা কোন ব্যক্তিও নির্বিবাদে শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চন্ততার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৬. অর্থাৎ এসব অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে সে কি এই অহংকারে মত্ত হয়েছে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করাবার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আখেরাত আসার আগে এই

দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা-কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছ্বাস তাকে একথা বলে দেবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কতটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংগু করে দিয়ে যায়। ভাগ্যের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিক্ষেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিম্মত কারোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না?

৭. اَنْفَقْتُ مَالاً لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেছি বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে اَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَدًا "আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি। এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বক্তা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুঁকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোন্ কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়াতগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ্যতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। তোশামোদকারী কবিদেরকে সে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে। বিবাহ ও শোকের মজলিসে হাজার হাজার লোককে দাওয়াত দিয়ে আহার করিয়েছে। জুয়া খেলায় গো-হারা হেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে। জুয়ায় জিতে শত শত উট জবাই করে ইয়ার বন্ধুদের ভূরি ভোজন করিয়াছে। মেলায় ধূমধাম করে গিয়েছে এবং অন্যান্য সরদারদের চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক ও আড়ম্বর দেখিয়েছে। উৎসবে অঢেল খাবার তৈরি করেছে এবং যে চায় সে এসে খেয়ে যেতে পারে বলে সব মানুষকে খাবার জন্য সাধারণ আহবান জানিয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে প্রকাশ্য লংঘরখানা খুলে দিয়েছে, যাতে দূর-দূরান্তে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক ধনীর দানশীলতার তুলনা নেই। এসব এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহর ছিল যেগুলোকে জাহেলী যুগে মানুষের দানশীলতা ও ঔদার্যের নিদর্শন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের নিশানী মনে করা হতো। এসবের জন্য তাদের প্রশংসার ডংকা বাজতো, তাদের প্রশংসায় কবিতা রচিত ও পঠিত হতো এবং তারা নিজেরাও এজন্য অন্যের মোকাবেলায় নিজেদের গৌরব করে বেড়াতো।

৮. অর্থাৎ এই গৌরবকারী কি দেখে না, ওপরে আল্লাহও একজন আছেন? তিনি দেখছেন সবকিছু। কোন্ পথে সে এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, কোন্ কাজে ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, কোন্ নিয়তে ও স্বার্থে সে এসব কাজ করেছে তা তিনি দেখছেন। সে কি মনে করে, আল্লাহর ওখানে এই অমিতব্যয়িতা, খ্যাতিলাভের আকাংখা ও অহংকারের কোন দাম হবে? সে কি মনে করে, দুনিয়ায় মানুষ যেমন তার কাজেকর্মে প্রতারিত হয়েছে তেমনি আল্লাহও প্রতারিত হবেন?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বুদ্ধির উপকরণগুলো দেইনি? দু'টি চোখ মানে গরু ছাগলের চোখ নয়, মানুষের চোখ। যে চোখ মেলে তাকালে চারদিকে এমনসব নিশানী নজরে পড়বে, যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সন্ধান দেবে এবং তাকে ভুল ও নির্ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। জিহবা ও ঠোঁট মানে নিছক কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রগুলোর পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

১০. অর্থাৎ শুধুমাত্র বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য ছেড়ে দেইনি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহ্‌রেও এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ "আমি মানুষকে একটি মিশ্রিত বীর্য থেকে পয়দা করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" (২-৩ আয়াত) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্‌দাহর ৩-৫ টীকা।

১১. মূল বাক্যটি হচ্ছে, فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ এখানে ইকতিহাম (اقتحام) মানে হচ্ছে, নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃংগে যাবার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ (عقبه)। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাংখা এবং শয়তানের প্ররোচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বাঁধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১২. ওপরে তার অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধপতন রোধ করে তাকে উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসত্বমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঋণমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচ্ছল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নিকটবর্তী (অর্থাৎ আত্মীয় বা

প্রতিবেশী) এতিম এবং এমন কোন ধরনের অসহায় অভাবীকে আহার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায় যাকে দারিদ্র ও উৎকট অর্থহীনতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে এবং যাকে হাত ধরে তোলার কেউ নেই। এই ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজে না। এদেরকে খাওয়ালে কারো ধনাঢ্যতা ও বদান্যতার তেমন কোন চর্চা হয় না। বরং হাজার হাজার সচ্ছল ব্যক্তি ও ধনীদের জন্য শানদার জিয়াফতের ব্যবস্থা করে তার তুলনায় অনেক বেশী শোহরতের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। فَكُّ رَقَبَةٍ (গলাকে দাসত্বমুক্ত করা) সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হুরাইরা (রা)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ।) হযরত আলী ইবনে হুসাইন (ইমাম যইনুল আবেদীন) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে মারজানাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি নিজে আবু হুরাইরার (রা) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি জবাব দেন, হাঁ। কথা শুনে ইমাম যইনুল আবেদীন নিজের সবচেয়ে মূল্যবান গোলামটিকে ডাকেন এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আযাদ করে দেন। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, এই গোলামটির জন্য লোকেরা তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শা'বী (র) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, গোলাম আযাদ করা সাদকার চাইতে ভালো। কারণ আল্লাহ সাদকার কথা বলার আগে তার কথা বলেছেন।

মিসকিনদের সাহায্য করার ফজিলত সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও অসংখ্য হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে। এর মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

الساعى على الارملة والمسكين كالساعى فى سبيل الله واحسبه

قال كالقائم لايفتروكا لصائم لا يفطر -

"বিধবা ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (আর হযরত আবু হুরাইরা বলেন ঃ) আমার মনে হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) একথাও বলেন যে, সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নামাযে রত আছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে যাচ্ছে, আরাম করছে না এবং সেই রোযাদারের মতো যে অনবরত রোযা রেখে যাচ্ছে, কখনো রোযা ভাঙে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

এতিমদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য বাণী রয়েছে। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ﴿٢٠﴾

তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে[১৩] এবং যারা পরস্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।[১৪] এরাই ডানপন্থী। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে তারা বামপন্থী।[১৫] এদের ওপর আগুন ছেয়ে থাকবে।[১৬]

বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের ভরণ পোষণ করে সে ও আমি জান্নাতে ঠিক এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দু'টি পাশাপাশি রেখে দেখান এবং দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।" (বুখারী) হযরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন, "মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটিই সর্বোত্তম বাড়ি এবং যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে অসদ্ব্যবহার করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি।" (ইবনে মাজাহ, বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)। হযরত আবু উমামাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন এতিমের মাথার হাত বুলায় এবং নিছক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বুলায়, সে ঐ এতিমের মাথায় যতগুলো চুলের ওপর হাত বুলিয়েছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য নেকী লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতিম ছেলে বা মেয়ের সাথে সদ্ব্যবহার করে সে ও আমি জান্নাতে এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের দু'টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিযী)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে কোন এতিমকে শামিল করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোনাহ করে থাকে তাহলে ভিন্ন কথা (শারহুস সুন্নাহ) হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, "আমার মন বড় কঠিন।" রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, "এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহার করাও।" (মুসনাদে আহমাদ)।

১৩. অর্থাৎ ওপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু'মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আল্লাহর কাছেও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (১২৪

আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।" (৯৭ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে ঃ "পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মু'মিন হয় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক।" (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিময়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, "তারপর সে ঈমান এনেছে।" বরং বলা হয়েছে, "তারপর সে তাদের মধ্যে শামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।" এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু'মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবদ্ধভাবে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী। অন্যদিকে অসৎবৃত্তি ও পাপ নির্মূল হয়ে যাবে, যেগুলো খতম করাই ছিল ঈমানের মৌলিক চাহিদার অন্তরভুক্ত।

১৪. এখানে মুসলিম সমাজের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টকে দু'টি ছোট ছোট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরস্পরকে সবর করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা পরস্পরকে রহম ও পরস্পরের প্রতি স্নেহার্দ্র ব্যবহারের উপদেশ দান করবে।

সবরের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মু'মিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। তার মোকাবেলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চণার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাফরমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও ভোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মু'মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের সন্তান-সন্তুতির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জ্বিন শয়তানদের। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত এবং জিহাদও করতে হয়। এসব

অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, এক একজন মু'মিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সবসময় পরাজিত হবার ভয় থাকে। অতি কষ্টে হয়তো সে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে যদি মু'মিনদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেকটি সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সবরের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরস্পরকে সাহায্য সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের ডালি এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সীমাহীন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষের সমাজকে ন্যায়, সততা ও নেকীর পথে আনার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ঈমানদারদের সমাজের বৈশিষ্টই হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালেম, নির্দয়, বেরহম, পাষাণ হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি স্নেহশীল, করুণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরস্পরের জন্য সহানুভূতিশীল ও পরস্পরের দুঃখে–শোকে বেদনা অনুভবকারী একটি সংবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মু'মিন হয় আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রকাশ এবং দলগতভাবেও মু'মিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিনিধি যার প্রশংসায় বলা হয়েছে– وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করুণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি। আম্বিয়া ঃ ১০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতের মধ্যে এই রহম ও করুণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীগুলো দেখুন। এগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কি ছিল তা জানা যাবে। হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَايَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّايَرْحَمُ النَّاسَ

"যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।"

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ – اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ –

"রহমকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করো। আকাশবাসী তোমার প্রতি রহম করবেন।" (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন ঃ مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ "যে ব্যক্তি রহম করে না তার প্রতি রহম করা হয় না।" (বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" (তিরমিযী)

ইমাম আবু দাউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসেম (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِىٍّ "হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই রহম তুলে নেয়া হয়।" (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী)

হযরত 'ঈয়ায ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিন ধরনের লোক জান্নাতী। তার মধ্যে একজন হচ্ছে ঃ

رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ -

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক আত্মীয় ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দয়ার্দ্র হৃদয় ও কোমল প্রাণ" (মুসলিম)

হযরত নু'মান ইবনে বশীর বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى -

"তোমরা মু'মিনদেরকে পরস্পরের মধ্যে রহম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের মতো পাবে। যদি একটি অংগে কোন কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে সারা দেহ তাতে নিদ্রাহীনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "মু'মিন অন্য মু'মিনের জন্য এমন দেয়ালের মতো যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।" (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِى حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِى حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না এবং তাকে সাহায্য করতেও বিরত হয় না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

সৎকর্মকারীদেরকে ঈমান আনার পর ঈমানদারদের দলে শামিল হবার যে নির্দেশ কুরআন মজীদের এই আয়াতে দেয়া হয়েছে তার ফলে কোন্ ধরনের সমাজ গঠন করতে চাওয়া হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তিগুলো থেকে জানা যায়।

১৫. ডানপন্থী ও বামপন্থীর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে সূরা ওয়াকি'আর তাফসীরে করে এসেছি। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল ওয়াকি'আ ৫–৬ টীকা।

১৬. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে তা থেকে বের হবার কোন পথ থাকবে না।